হজ্জ

* দর্শন
* গুরুত্ব
* দিক নির্দেশনা
* আহকাম

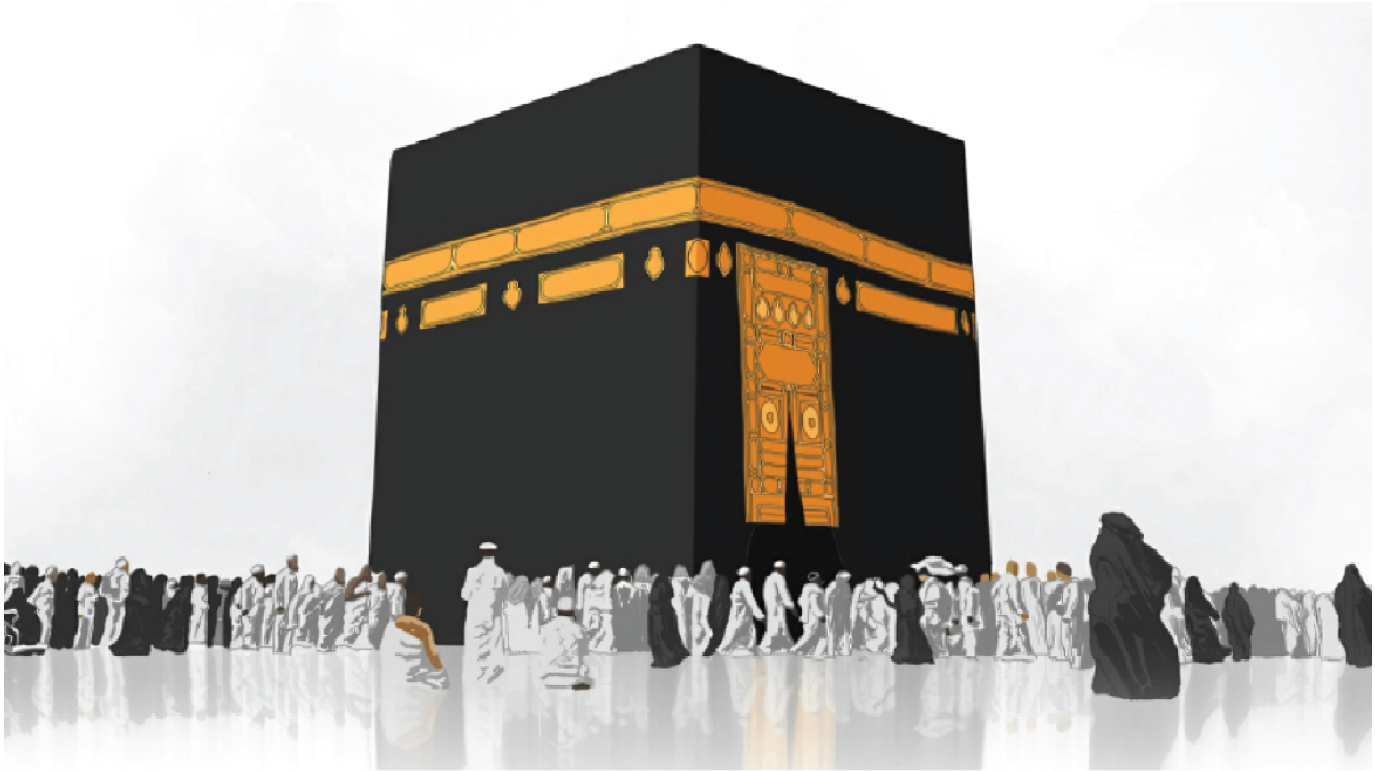

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

হজ্জ

* দর্শন
* গুরুত্ব
* দিক নির্দেশনা
* আহকাম

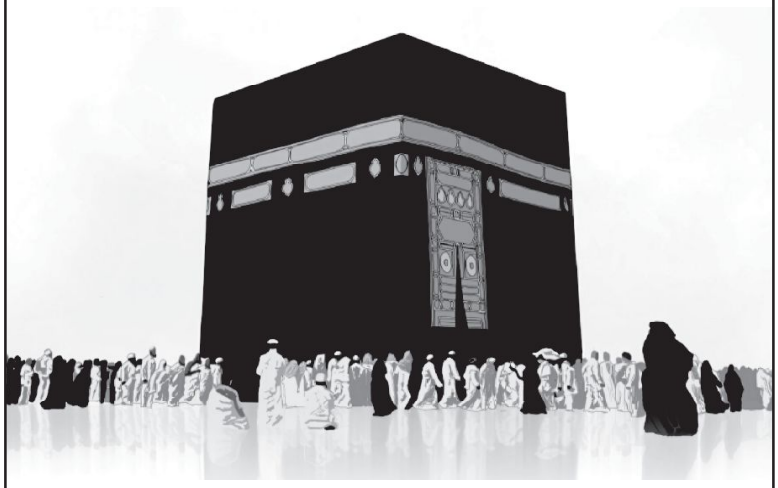

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

হজ্জ

*দর্শন
*গুরুত্ব
*দিক নির্দেশনা
*আহকাম

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

হজ্জ
***দর্শন *গুরুত্ব *দিক নির্দেশনা *আহকাম**

গ্রন্থকার:
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রকাশকাল:
মার্চ : ২০২৫
রামাদান : ১৪৪৬
ফাল্গুন : ১৪৩১

প্রকাশক
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত
৩/এ, আমানাহ ভবন
রোড নং ১০/এ, হিলভিও হাউজিং সোসাইটি
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০১৮১৯৩১৬০০৭

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসাজ: আলমগীর ইমন
বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ: ইতিবৃত্ত, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পরিবেশক
সালফি পাবলিকেশন্স, অমর বইঘর, সাহিত্য বিচিত্রা এবং দুরন্ত প্রকাশ।
অনলাইন পরিবেশক: রকমারি.কম

মূল্য: ২০০/- (দুইশত টাকা) USD 4.00

Hajj : Darshan, Gurutta, Dik nirdeshana, Ahkam (Hajj : Philosophy, Iportance, Guidelines, Rulings)
Written by Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Published by The Author, 3/A Amanh Bhavan Road, 10/A Hillview Housing Society, Panchlaish, Chattogram, Phone: 01819316007

Price: Tk. 200/- USD 4.00

ISBN: 978-984-99335-2-6

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা সে মহামহীম প্রভু আল্লাহ তা'লার জন্য, যিনি হজ্জের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি ব্যাপক ধর্মীয় ও অর্থবহ (Comprehensive) গ্রন্থ রচনার তাওফীক্ব দিয়েছেন, এবং দরূদ ও সালাম সৃষ্টির সেরা ও নবীকূল শিরোমণি সেই মহানবী (ছ.) এর প্রতি, যিনি তাঁর উম্মতের জন্য দিয়ে গেছেন মিল্লাতে ইবরাহীমীর মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার এক সঠিক দিক নির্দেশনা।

'হজ্জের দর্শন, গুরুত্ব, দিক নির্দেশনা ও আহকাম' গ্রন্থটি হজ্জ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য পুস্তকাবলি হতে স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমধর্মী একটি গ্রন্থ। প্রচলিত পুস্তকসমূহ হজ্জের নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালনের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন দু'আ ও যিকর-আযকার সংক্রান্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু এ গ্রন্থটিতে শুধু মাত্র হজ্জের রীতি-নীতি, অনুষ্ঠানিকতা ও হাজীদের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কিত দিক নির্দেশনার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং এতে হজ্জের দর্শন কী? কী তার ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং কোথায় তার যৌক্তিকতা এবং হজ্জ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমের জীবনে কীরূপ দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে এর সবই বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি পাঠে সাধারণভাবে মুসলিম ভাই-বোনেরা এবং বিশেষভাবে হজ্জ-যাত্রীগণ হজ্জের গূঢ়তত্ত্ব, এর ইতিহাস ও শিক্ষা এবং কুর'আন হাদীছের আলোকে এর সঠিক পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দিকনির্দেশনা লাভে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে উমরাহ পালনের গুরুত্ব এবং সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া মসজিদে নববীর গুরুত্ব,

রওযায়ে আক্বদাস যেয়ারতের রীতি-নীতি এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মদীনার বিভিন্ন স্থানসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হয়েছে, যা মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন থেকে নিয়ে নবীজীর আদর্শ, জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত।

গ্রন্থটি পাঠে যদি বাংলা ভাষা-ভাষী ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা এবং হজ্জে গমণেচ্ছু ভাইয়েরা উপকৃত হতে পারেন তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব।

আল্লাহ আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান আহরণ, চর্চা ও অধ্যয়ন এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন।

আমীন!

ড. আবু বকর রফীক

সূচি

প্রথম অধ্যায়

- হজ্জের মাহাত্ম ও দর্শন ১৩
- কে ছিলেন ইবরাহীম (আ.)? ১৪
- ইবরাহীম (আ.) বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পেলেন কীভাবে? ১৪
- কী ছিল সেই পরীক্ষাসমূহ? ১৫
- ক) আপন উৎকণ্ঠা ও বিচক্ষণতায় তাওহীদের আবিস্কার ১৬
- খ) ছয় শতাধিখ দূরবর্তী নির্জন উপত্যকায় একমাত্র সন্তানকে রেখে আসার বিষয়ে নির্দ্বিধায় আল্লাহর আদেশ পালন ১৮
- কী পরিণতি হয়েছিল শিশু ইসমাঈল ও বিবি হাজেরার ২১
- গ) কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন ইবরাহীম (আ.) ২২
- ইবরাহীম (আ.) কে নেতা হিসেবে মান্য করার ফলশ্রুতি ২৬
- মুসলিম উম্মাহ পরিভাষাটি ইবরাহীম (আ.) এরই দেয়া নাম ২৯
- কা'বাগৃহকে কেবলা রূপে চিহ্নিত করে নামায আদায় ৩১
- কা'বাগৃহের মর্যাদা এবং তার উদ্দেশে হজ্জ করার বিষয়ে পবিত্র কুর'আনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ৩১
- অতএব হজ্জ কী? ৩২
- পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম ইবাদতগাহের উদ্দেশে সফর ৩৩
- বিশেষ পরিধেয় পরিহিত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দান ৩৩
- বেহেশতী পাথরের স্পর্শ লাভে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য ৩৬
- আপন কৃত অপরাধের অকপট স্বীকারুক্তি ও অনুশোচনা ৩৬
- জান্নাতি ঝর্ণাধারা যমযম পানের বিরল সৌভাগ্য ৩৭
- ইতিহাসের গতিধারায় যমযমের চড়াই উৎরাই ৩৮
- মহানবী (স.) এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের এক মহা কীর্তি,

যমযমের আবিস্কার ৩৯
➠ ছাফা মাওয়ার সা'ঈ : বিবি হাজেরার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৪১
➠ মিনার উদ্দেশ্যে পাগল-পারা বান্দাদের বিশাল ঢল, এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা ৪৪
➠ আরাফাতের স্বীকারুক্তি রোয কেয়ামতের বিভীষিকা হতে বাচার প্রস্তুতি ৪৫
➠ মুযদালিফা : আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ করার আরো প্রশিক্ষণ, আরো প্রতিশ্রুতি ৪৭
➠ রময়ুল জিমার : পরবর্তী জীবনে শয়তানের আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করার উপায় ৪৮
➠ কুরবানী তথা দম দেয়ার প্রথা : ত্যাগের এক মহান আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ৫০
➠ ত্বাওয়াফ আয-যিয়ারাহ ও আল্লাহর মাহাত্মের এক পরম নিদর্শন ৫১
➠ হজ্জ দর্শন সম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর মন্তব্য ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় (হজ্জের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যসমূহ)
➠ হজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব ৫৪
➠ হজ্জ আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সর্বোত্তম উপায় ৫৬
➠ মিল্লাতে ইবরাহীমির যথাযথ অনুসরণের সঠিক পন্থা ৫৯
➠ হজ্জের সফর : খোদা প্রেম ও আনুগত্যের প্রতীক ৬০
➠ হজ্জ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের সর্বোত্তম অর্ঘ্য ৬১
➠ হজ্জ মিল্লাতে ইবরাহীমির অনুসারীদের বার্ষিক সম্মেলন ৬২
➠ হজ্জ মুসলিম মিল্লাতের পরিশুদ্ধি, মানবতার মুক্তি ও জেহাদের স্থায়ী কেন্দ্র ৬২
➠ হজ্জের রাজনৈতিক গুরুত্ব ৬৩
➠ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনা ৬৬
➠ হজ্জের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ৬৬
➠ যুক্তির কষ্টিপাথরে হজ্জের গুরুত্ব ৬৭
  ➠ ক) হজ্জ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক ৬৭
  ➠ খ) হজ্জ মহৎ কিছু অর্জনের পথে ত্যাগ স্বীকারের এক উৎকৃষ্ট শিক্ষা ৬৮
  ➠ গ) হজ্জে শ্লোগান তথা তালবিয়া হচ্ছে আল্লাহর মহাত্ম প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা ৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

- হজ্জের সাংস্কৃতিক দিক নির্দেশনা ৭০
- হজ্জের মধ্যে কী কী উপকারিতা রয়েছে ৭১
- হজ্জের সংস্কৃতিক দিক দর্শন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৭৪
- হজ্জ মুসলমানদের আক্বীদাকে পরিস্কার করে ৭৫
- হজ্জের তালবিয়্যাহ হচ্ছে তাওহীদেরই শ্লোগান ৭৫
- হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিধানের প্রতীক ৭৬
- হজ্জ ধর্মীয় নিদর্শনাবলির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয় ৭৮
- হজ্জের মাধ্যমে অর্জিত দুটি ভিন্নধর্মী উদ্দেশ্য ৮০
- হজ্জ রোজ হাশরে আল্লাহর সম্মুখে বান্দাদের দণ্ডায়মান হওয়ার চেতনাকে জাগ্রত করে ৮১
- হজ্জ মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধির এক মোক্ষম পদ্ধতি ৮২
- হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানীকে স্পর্শ করার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের শিক্ষা দেয় ৮২
- হজ্জ অন্তরে তাওহীদের ভিত্তিকে মযবুত করার সর্বোত্তম মাধ্যম ৮৩
- হজ্জ মুসলিম ব্যক্তিকে হালাল রুযীর পথ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করে ৮৩
- হজ্জ মুসলিম ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমের প্রতি আত্মনিবেদনের শিক্ষা দেয় ৮৩
- হজ্জ একজন মুমিনের মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে ৮৫
- হজ্জ দা'ঈ ইলাল্লাহর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দাওয়াতী কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি করে ৮৬
- হজ্জ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আদর্শকে সমুন্নত করে ৮৬
- বিদায় হজ্জে নবীজীর প্রদত্ত ইতিহাসে বৃহত্তম মানবাধিকার ঘোষণা ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়

- হজ্জের নিয়ম-নীতি ৯০
- হজ্জের কিছু মৌলিক পরিভাষা ৯০
- হজ্জের নিয়মাবলি ৯৬
- হজ্জের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা ৯৬
- হালালভাবে উপার্জিত অর্থ দিয়েই হজ্জ করা ৯৬
- হজ্জ যেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হয় ৯৭
- হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বশর্ত ৯৭

➠ হজ্জের প্রকারভেদ ৯৭
➠ কোন প্রকারের হজ্জ উত্তম? ৯৮
➠ হজ্জের আরাকান ও আহকাম ৯৮
➠ হজ্জের ফরযসমূহ ৯৯
➠ হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ৯৯
➠ হজ্জের সুন্নাতসমূহ ১০০
➠ ইহরামের নিয়মাবলি ১০০
➠ মহিলাদের ইহরাম ১০১
➠ হজ্জে ইফরাদ তথা শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম ১০২
➠ হজ্জে ক্বিরান তথা একত্রিতভাবে উমরাহ ও হজ্জ পালনের ইহরাম ১০২
➠ হজ্জে তামাত্তু পালনকারীর জন্য ইহরামের পদ্ধতি ১০২
➠ মুহরিমদের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় ১০৩
➠ মীক্বাতে যামানী ও মীক্বাতে মাকানী ১০৪
➠ ঋতুবতী মহিলাদের ইহরাম ১০৭
➠ ইহরাম অবস্থায় হারাম এলাকায় প্রবেশ ও মক্কায় আগমনের পর করণীয় কাজসমূহ ১০৭
➠ ত্বাওয়াফের পর দু'রাকা'ত নামায প্রসঙ্গে ১১০
➠ যমযম প্রসঙ্গে ১১০
➠ সাঈ'র নিয়ম পদ্ধতি ১১১
➠ হজ্জের মূল দিবসসমূহে হাজীদের করণীয় ১১৩
➠ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পাঠ করার জন্য কুরআন হাদীছ সমর্থিত কিছু দু'আ ১১৭
➠ ১০ই যিল-হিজ্জাহর রাত্রিবেলায় করণীয় ১২১
➠ ১০ই যিল-হিজ্জা সকালে করণীয় ১২২
➠ পশুর দম দেয়া বা হাদী যবেহ করা প্রসঙ্গে ১২৩
➠ হালাক্ব অথবা তাক্বছীর ১২৪
➠ তাহাল্লুল আউয়াল কখন? ১২৪
➠ ত্বাওয়াফুয-যিয়ারাহ ১২৪
➠ ত্বাওয়াফুয-যিয়ারাহ এর পরে সা'ঈ করার বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে ১২৫
➠ আইয়ামে তাশরীক্বে মিনাতে অবস্থান প্রসঙ্গে ১২৬
➠ ত্বাওয়াফুল বিদা কী এবং কখন? ১২৭
➠ হজ্জের বিভিন্ন কর্মের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভ্রান্তির অপনোদন ১২৮

- ইহরাম সম্পর্কিত ভ্রান্তিসমূহ ১২৮
- মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে কৃত গলদসমূহ ১২৮
- ত্বাওয়াফকালে কৃত গলদসমূহ ১২৯
- সা'ঈ করাকালীন কৃত গলদসমূহ ১২৯
- হালক্ব ও তাক্বছীরের ক্ষেত্রে কৃত গলদসমূহ ১৩০
- মিনা, মযদালিফা ও আরাফাতে কৃত গলদসমূহ ১৩০
- কিছু সাধারণ ভুল ভ্রান্তির অপনোদন ১৩২

পরিশিষ্ট

- উমরাহ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারত ১৩৩
- উমরাহ এর সংজ্ঞা ও নিয়ম-কানুন ১৩৩
- উমরাহর পদ্ধতি ১৩৪
- মদীনা-মুনাওয়ারার যিয়ারত ১৩৬
- মদীনা-তাইয়িবার কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বিবরণ ১৪১

وأتموا الحج والعمرة لله

প্রথম অধ্যায়

হজ্জের মাহাত্ম ও দর্শন

হজ্জ কথাটি মূলত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা, কোনো স্থান পরিদর্শনের সংকল্প করা ইত্যাদি। আর পারিভাষিক অর্থে হজ্জ হচ্ছে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়-কালে ইসলামের অনুসারীদের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে আল্লাহর ঘর তথা কা'বাগৃহের ত্বাওয়াফ করা এবং আল্লাহর রাসূল (ছ.) কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় কিছু সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা তথা আরাফায় অবস্থানসহ কিছু আরকান-আহকামসমূহ পালন করা।

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি অপরিহার্য করণীয় তথা পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিম অর্থাৎ শারীরিকভাবে সক্ষম ও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ আদস্থায় করা ফরয।

মূলত হজ্জ আমাদেরকে মানবেতিহাসের এক মহান নেতা ইবরাহীম (আ.) এর সাথে এক যোগসূত্র সৃষ্টি করে দেয়। হজ্জের প্রতিটি কাজের সাথে জড়িত রয়েছে ইবরাহীম (আ.) এর পূণ্যময় স্মৃতি। আর এ স্মৃতি চর্চা করার জন্য মুসলামানদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র আল-কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [سورة آل عمران: 95]

অর্থাৎ– "তোমরা একাগ্রতা সহকারে ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসারী হও।"

পবিত্র কা'বাগৃহ হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নির্দেশে তৈরিকৃত সর্ব প্রথম গণ ইবাদতগাহ। এ ঘরটি দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চিহ্ন থাকার পর ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তা প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে কা'বাগৃহের অস্তিত্ব আর এক মুহূর্তের জন্যও বিলুপ্ত হয়নি।

তাছাড়া ছাফা-মারওয়ার মধ্যে দৌড়, কুরবানী, যমযম, মীনা, মুযদালিফা, আরাফা ইত্যাদি সব কিছুর রন্দ্রে রন্দ্রে জড়িত আছে ইবরাহীম (আ.) এর স্মৃতি।

কে ছিলেন ইবরাহীম (আ.)?

বর্তমান বিশ্বের তিনটি বৃহৎ ধর্মীয় জনগোষ্ঠী তথা মুসলিম, খ্রিষ্টান ও য়াহুদীগণ যে ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী হচ্ছে পৃথবীর দুই তৃতীয়াংশ লোক, তাদের সবাই এ কথা বিশ্বাস করেন যে ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাদের নেতা এবং তারাও ইবরাহীম (আ.) এর দীনের অনুসারী। কেননা ইবরাহীম (আ.) এর পর তাওহীদের আহ্বান তথা মানব জাতিকে হেদায়াতের পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব ও নুবুওয়াতের নে'মত অনেকটা ইবরাহীম (আ.) এর বংশধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। ইবরাহীম (আ.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমা'ঈলের বংশধারায় একটি মাত্র নবীর আগমন ঘটলেও য়াকুব, য়ূসুফ, শো'য়াইব, মুসা, হারূন, দাঊদ, সোলায়মান ও 'ঈসা (আ.) এর সকলেই ছিলেন বনী ইসরা'ঈল তথা ইসহাক্বের বংশধারার নবী। আর আখেরী নবী মুহাম্মদ (ছ.) হচ্ছেন ইবরাহীম (আ.) এর জ্যেষ্ঠ সন্তান তথা বনী ইসমা'ঈলের বংশে প্রেরিত একমাত্র নবী। এভাবে দেখা যায় যে, কী মুসলিম কী খৃষ্টান কী য়াহুদী সকলেই ধর্মীয় দিক দিয়ে ইবরাহীম (আ.) এর সাথে সম্পর্কিত। আর ইবরাহীম (আ.) হচ্ছেন সকলেরই ধর্মগুরু বা জাতির পিতা।

ইবরাহীম (আ.) বিশ্বাবাসীর নেতৃত্ব পেলেন কীভাবে?

ইবরাহীম (আ.) এ পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন আজ হতে চার হাজার বছর পূর্বে। বাইবেলেরে বর্ণনা মতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আর তিনি ১৭৫ বছর কাল জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর জন্ম হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ২১৬০ অব্দে। এ দীর্ঘ চার হাজার বছর যাবৎ যে ব্যক্তিটির নেতৃত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর কোনো তাওহীদবাদী ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত নেই তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম (আ.)।

নেতৃত্ব মূলত দু'প্রকারের; রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্ব। রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজন অস্ত্রবল, জনবল প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও বিচক্ষণতা। আর ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন সম্মোহনী

(Charismatic) ব্যক্তি চরিত্র, আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ ও অনুসৃত হওয়ার মতো মহান আদর্শ ইত্যাদি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থান কাল ও পাত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্ব স্থান কাল পাত্রের পরিসীমা অতিক্রান্ত করতে সক্ষম। রাজনৈতিক নেতৃত্ব মূলত নেতার নিজস্ব অর্জন, কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্ব ঐশী তথা খোদা প্রদত্ত। তবে ধর্মীয় নেতৃত্বে যে কোনোরূপ মেকী বা কৃত্রিমতার অবকাশ নেই তা নয়, কিন্তু এ জাতীয় নেতৃত্বের আবেদন ও পরিসর হয়ে পড়ে খুবই সীমিত।

এবার ইবরাহীম (আ.) এর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। আল কুর'আনের ভাষায় ইবরাহীম (আ.) একের পর এক বহু অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহর কাছ থেকে এ বিশ্ব নেতৃত্ব লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

سورة البقرة : ١٢٤

অর্থাৎ– "(স্মরণ করো সে ঘটনার কথা) যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কিছু আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন আর সে এ পরীক্ষায় যথাযথ ভাবে উত্তীর্ণ হলো। (তখন তার) রব তাকে জানিয়ে দিলেন আমি তোমাকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর উপর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করতে যাচ্ছি। ইবরাহীম বলল– আমার বংশধরদের জন্যও কি ইহা প্রযোজ্য? আল্লাহ বল্লেন– পাপীষ্ঠদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য নয়।" [আল বাকারা, [২ : ১২৪]

কী ছিল সে পরীক্ষাসমূহ

এ কথা জানার পর যে ইবরাহীম (আ.) কে কিছু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুরস্কার স্বরূপ বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই সকলের অন্তরে এক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয় যে, কী ছিল সে সব পরীক্ষা? কেন সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এত কঠিন ছিল? ঐ সব

পরীক্ষা কী কী ছিল? সবগুলো হয়ত আমাদের কাছে জানা নেই। তবে আল কুর'আনে এর যে ক'টির উল্লেখ আছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব এখানে।

(ক) আপন উৎকণ্ঠা ও বিচক্ষণতায় তাওহীদের আবিস্কার

তিনি যখন উপলব্ধিজ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অধিকারী হলেন তখন তার মনে এ কথা জানার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে এ পৃথিবীর স্রষ্টা কে? কীভাবে চেনা যাবে তাঁকে? এ ভাবনা যখন তাঁর মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে আছে সে সময়ই তিনি পূর্ব দিগন্তে লক্ষ্য করলেন অনেকগুলো তারার মেলায় যেন একটি তারকা বিশেষভাবে জ্বলজ্বল করছে। তখন ভাবলেন– হয়ত ইহাই হবে সকল সৃষ্টির পেছনে প্রধান কার্যকারণ। আর তখন থেকেই এ উজ্জল তারকাটিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে থাকলেন। তিনি দেখতে পেলেন এ শুভ্র সমুজ্জল তারকাটি পূর্ব দিগন্ত হতে ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে স্থানান্তরিত হয়ে এক পর্যায়ে অস্তমিত হয়ে গেল। তখন ভুল ভাঙলো তাঁর, তিনি মনে মনে বললেন– না! অসম্ভব, যে বস্তু এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় তা কী করে স্রষ্টা হতে পারে? তিনি স্রষ্টার খোঁজে বিচলিত ছিলেন এমন সময় একদিন তার নজরে পড়ল যে পূর্ব দিগন্তের আঁচল চিরে বেরিয়ে আসল এক অদৃশ্যপূর্ব চন্দ্র, যা গোটা পৃথিবীকে শুভ্র সমুজ্জল রুপালি আলোতে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। তখন ভাবতে লাগলেন– এবার বুঝি খুঁজে পেলাম প্রকৃত রহস্য, স্রষ্টার প্রকৃত সন্ধান। কিন্তু যখন রাত শেষে এ চন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে অস্তমিত হলো তখনই তাঁর ভুল ভাঙলো। তিনি বললেন– না আমি বুঝি এখনও ভ্রান্তিতে আছি। এ চন্দ্রটি যা এ পর্যায়ে অস্তমিত হয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল তা কোনো অবস্থাতেই স্রষ্টা হওয়ার মতো বস্তু হতে পারে না। তা হলে কোথায় হবে এ স্রষ্টার অস্তিত্ব। প্রত্যুষে যখন পূর্ব দিগন্তে উদিত হলো অগ্নিপিণ্ডের মতো এক বস্তু সারা পৃথিবীকে সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত করে, তখন তিনি ভাবলেন এতদিন মনে হয় আমি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলাম, এখনই বুঝি জানতে পারলাম স্রষ্টার সঠিক পরিচয়। কারণ এর আকার-আকৃতি, সৌর্য-বীর্য, দীপ্তি ও জ্যোতি সবই অতুলনীয়। ইহা যদি স্রষ্টা না হবে তা হলে আর কে হবেন? তিনি এখন অনেকটা নিশ্চিত যে ইহাই স্রষ্টা। কিন্তু যখনই সে সূর্যটি চন্দ্র ও তারকার অনুরূপ যথারীতি অস্তমিত হয়ে গেল তখন তার ভুল ভাঙলো। এবার প্রকৃত তথ্য তার কাছে উদঘাটিত হলো। তিনি

বুঝতে পারলেন এসব কিছু যা দৃশ্যমান এবং শক্তিধর বলে প্রতীয়মান তার কোনোটিই স্রষ্টা হওয়ার মতো বস্তু নয়। আসল স্রষ্টা হচ্ছে ঐ মহান সত্ত্বা যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষের এ দিব্য দৃষ্টিতে দৃশ্যমান নন বটে। কিন্তু সৃষ্টির প্রতিটি কণায় তাঁর নিদর্শন পরিস্ফুটিত।

এ সত্য উদঘাটিত হওয়ার পাশাপাশি তিনি যখন দেখতে পেলেন যে খোদ তাঁর পিতা একজন মূর্তি তৈরির শিল্পী এবং রাজা থেকে নিয়ে সমাজের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মূর্তিপূজার নেশায়, তখন প্রথমে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। একপর্যায়ে খোদ তাঁর পিতা তাকে এ বলে হুমকি দিলেন যে, পূণরায় যদি তাকে মূর্তিদের গাল মন্দ করতে শোনা যায় তা হলে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তখন বালক ইবরাহীম সংকল্প করলেন যে এ মূর্তিকে তিনি নিজ হাতে চুরমার করেই তবে ক্ষ্যান্ত হবেন। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। এক দিন তিনি সুযোগ মত সেখানকার বৃহত্তম মন্দিরে প্রবেশ করে সব মূর্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন। শুধুমাত্র বড় মূর্তিটি বাদ রাখলেন, আর তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন একটি কুঠার। মন্দিরের পুরোহিত যখন পরে এসে ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পেল তখন পুরো অঞ্চলে এক আহাযারীর রোল পড়ে গেল। তবে তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, বালক ইবরাহীমই এর মূল হোতা। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি সাব্যস্ত হলো। তাও আবার স্বাভাবিক মৃতুদণ্ড নয়, এক বিশাল জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাকে জীবন্ত নিক্ষেপের মাধ্যমেই কার্যকর করতে হবে এ অভিনব মৃতুদণ্ড। এ ভয়াবহ শাস্তির কথা শুনেও বালক ইবরাহীম নির্বিকার। তিনি এতে মোটেই বিচলিত নন। কারণ তাঁর দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে, তিনি যা করেছেন তা অত্যন্ত সঠিক কাজ। কাজেই এর জন্য তাকে যত বড় শাস্তিরই সম্মুখীন হতে হোক না কেন তা তার জন্য গৌরবের বিষয় বটে। এ শাস্তি কার্যকর করার নির্ধারিত দিনক্ষণে ইবরাহীমকে বিশাল প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপও করা হলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য পরিণত হলো এক শান্তি নিকেতনে। এভাবে ইবরাহীম উত্তীর্ণ হলেন এক মহা কঠিন পরীক্ষায় পূর্ণমানের অধিকারী হয়ে। ইবরাহীম (আ.) কি কখনও ভেবেছিলেন যে এ শাস্তি থেকে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবেন? না। তিনি তা জানতেন না। বরং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। তবুও তিনি এ শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তার সামনে ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু আল্লাহই তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন অলৌকিকভাবে।

খ) ছয় শতাধিক মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এক নির্জন উপত্যকায় একমাত্র সন্তানকে রেখে আসার বিষয়ে নির্দ্বিধায় আল্লাহর আদেশ পালন

বাইবেলের বর্ণনা মতে ইবরাহীম (আ.) এর বয়স যখন ৮৬ বছর তখন তাঁর ঔরসে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম লাভ করেন তাঁর প্রথম সন্তান ইসমা'ঈল। বাইবেলের এ বর্ণনা সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। কেননা এর বিরুদ্ধে আল কুর'আন এবং হাদীছেও কোনো ভিন্ন বক্তব্য নেই। এ সন্তান যখন দুগ্ধপায়ী শিশু তখন ইবরাহীম (আ.) প্রভুর আদেশ পেলেন মা ও শিশুকে মক্কার তরুলতা বিহীন এক নির্জন উপত্যকায় রেখে আসার জন্যে। তখন ইবরাহীম (আ.) কিন'আন নামক অঞ্চলে বসবাসরত ছিলেন যা পরবর্তী কালে ফিলিস্তীন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন'আন থেকে মক্কার দূরত্ব আনুমানিক ১০০০ কিলোমিটার।

চিন্তা করে দেখুন ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধ যিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক সন্তান লাভ করলেন তার পক্ষে ১০০০ কিলোমিটার দূরবর্তী এক শ্যামলিকা ও তরুলতা বিহীন নির্জন উপত্যকায় আপন দুগ্ধপায়ী শিশুকে রেখে আসার আদেশ পালন করা কত কঠিন ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) এ আদেশ প্রাপ্ত হয়ে মোটেই বিচলিত হননি। তিনি প্রস্তুত হলেন শিশু ইসমা'ঈল ও তার মাকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার জন্য। সে যুগে কোনো উন্নত যানবাহন কিংবা যাতায়ত ব্যবস্থা ছিল না। মরুপ্রান্তর দিয়ে দূর পাল্লার পথ চলার একমাত্র বাহন হচ্ছে উট। আবার এ সফরের জন্য একাধিক উট ব্যবহারেরও কোনো অবকাশ নেই। তিনি তাঁর শিশু পুত্র ইসমা'ঈল ও তার মাকে নিয়ে যাত্রা করলেন সুদূর মক্কা উপত্যকার উদ্দেশে। কোথায় যাচ্ছেন একথা তাঁর স্ত্রীর কাছেও বলেননি। পথ চলতে চলতে কিছুদিন পর পৌঁছে গেলেন সে গন্তব্যস্থল মক্কা উপত্যকায়। যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে আল কুর'আনের ভাষায় (وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) তথা একটি তরুলতা বিহীন উপত্যকা। চতুর্দিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত একটি ছোট্ট উপত্যকা। কোথাও শ্যামালিকার কোনো চিহ্ন কিংবা পানির কোনো উৎস নেই। ইবরাহীম (আ.) তাদের জীবন ধারণের জন্য যা রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ছিল বড়জোর এক মশক পানি এবং এক থলে খেজুর। এমতাবস্থায় এরূপ একটি নির্জন উপত্যকায় এক দুগ্ধপায়ী শিশু ও তার মা, তথা এক অসহায়া-অবলা নারীকে একাকী রেখে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করে যাওয়া। কিন্তু এ ব্যাপারে

ইবরাহীমের (আ.) কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

বর্ণিত আছে যে, তিনি যে সময় তাঁর শিশুপুত্র ইসমা'ঈলকে রেখে যাচ্ছিলেন তখন নাকি বর্তমান যমযমের স্থানে একটি বিশালকায় পাহাড়ী কুল বৃক্ষ ছিল। পত্র-পল্লবে সুশোভিত না হলেও অন্তত প্রখর রৌদ্রের দাবদাহ থেকে আশ্রয় নেওয়ার মতো কিছু ব্যবস্থা ছিল ঘন ডাল পালা ও বৃহদাকার কাণ্ডের আড়ালে। এও বর্ণিত ছিল যে, ইবরাহীম (আ.) যখন শিশু ইসমা'ঈল ও তার মাকে মক্কা উপত্যকায় রেখে কিন'আন অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যত হলেন তখন স্ত্রী হাজেরা তাঁর কাছে প্রশ্ন করলেন– "ইবরাহীম আপনি কার আদেশে আমাদেরকে এখানে ছেড়ে যাচ্ছেন?" ইবরাহীম শান্তভাবে জবাব দিলেন– 'আল্লাহর আদেশে।' তখন নাকি হাজেরা মন্তব্য করেছিলেন– তাহলে ঠিক আছে, আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। যেমন স্বামী তেমন স্ত্রী। স্বামী জানেন যে, এমন এক নির্জন উপত্যকায় তাঁর একমাত্র সন্তান ইসমা'ঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে রেখে যাচ্ছেন যেখানে না জীবন ধারণের নুন্যতম উপকরণ আছে আর না আছে কোনো লোকালয়। কিন্তু তবুও এ আদেশ পালনে তার মনে কোনোরূপ দ্বিধা বা চিন্তা নেই। কারণ তিনি জানতেন যে আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করাই হচ্ছে তাঁর দায়িত্ব। আর তাদের জীবন-মৃত্যু তো আল্লাহরই হাতে, তিনি যা ইচ্ছা তাই বাস্তবায়ন করেন। স্ত্রীরও বুঝতে বাকি থাকল না যে, যদি ইবরাহীমের এ কর্ম আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্যই হয়ে থাকে তাহলে তো আল্লাহ-ই তাদের পাহারাদার। কাজেই এর পরে আর ভাবনা কীসের? দুনিয়ার আর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো কি-না জানি না, ৮৬ বছর বয়সে লাভ করা একমাত্র পুত্র সন্তানকে ছয় শতাধিক মাইল দুরবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি নির্জন উপত্যকায় রেখে আসা। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) একে বাস্তবায়িত করেছিলেন কোনোরূপ প্রশ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আশ্রয় না নিয়ে। অতএব এ পরীক্ষাতেও তিনি পূর্ণ-মান লাভ করে উত্তীর্ণ হন।

ইবরাহীম (আ.) ইসমা'ঈল ও তাঁর মাকে মক্কা উপত্যকায় রেখে যাওয়ার মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কী বলে প্রার্থনা করছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। এ দু'আটি আল-কুর'আনে উদ্ধৃত হয়েছে নিম্নরূপ–

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ - سورة إبراهيم: 37

অর্থাৎ– "প্রভু হে মোদের! আমার পরিবারের একটি অংশ (তথা দু'স্ত্রীর অন্যতমা ও একমাত্র শিশুপুত্রকে) একটি শস্য শ্যামলিকা বিহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের সন্নিকটে বসবাস করিয়েছি। প্রভু হে মোদের! যেন তারা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অতএব জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন, আর তাদেরকে ফলমূলের মাধ্যমে রিযিক দান করুন, যাতে করে তারা আপনার শোকরিয়া আদায় করতে থাকে।" (সুরা ইবরাহীম: ৩৭)

আশ্চার্যের বিষয় যে, ইবরাহীম (আ.) যিনি আপন শিশুপুত্র ইসমা'ঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে ছয় শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত একটি নির্জন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছেন, তার মনে কোনোই ভয় নেই এরা ধ্বংস হয়ে যাবে কি-না, আর নেই কোনোরূপ উৎকণ্ঠা। তার প্রতিটি বাক্যে এ কথার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে যে এরা শুধু যে বেঁচে থাকবে তা নয় বরং এরা হবেন গোটা বিশ্ববাসীর ভালোবাসার আধার। তিনি দৃঢ় আশাবাদী যে, এ মক্কা উপত্যকা থেকেই শুরু হবে নামাযের ধারা, তথা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতের উৎস। তিনি আরো নিবেদন করেছেন এ দু'আ, এ জনপদে যেন যুগ-যুগ ধরে ফলমূলের প্রাচুর্য বিদ্যমান থাকে। মনে হচ্ছে এ নির্জন মক্কা উপত্যকাটি ভবিষ্যতে কীরূপ কোলাহল মুখর হবে তার একটি বাস্তব চিত্র ইবরাহীম (আ.) দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন করেছিলেন। বলা বাহুল্য ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রার্থনায় "তোমার পবিত্র ঘরের পার্শ্বে" বলে যে ঘরের কথা উল্লেখ করেছেন তখন সে গৃহের অস্তিত্ব ছিল না। কারণ তিনিই কিছু দিন পরে বালক ইসমা'ঈলকে নিয়ে আল্লাহর আদেশে কা'বাগৃহ প্রতিষ্ঠা করবেন। অবশ্য তিনি ওহী মারফত জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত স্থানে প্রাচীন কালে আল্লাহর ঘরটি বিদ্যমান ছিল। বর্ণনাকারীরা বলেন যে, তখনও না-কি বিলুপ্ত কা'বাগৃহের স্থানটি একটি ঢিবির মতো উঁচু ছিল।

ইবরাহীম (আ.) আজ থেকে চার হাজার বছর আগে যে দু'আ করেছিলেন তার বরকত দেখুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত এমন কোনো উৎকৃষ্ট ফলমূল নেই যা মক্কা নগরীতে পাওয়া যায় না। কি ব্রাজিলের কলা বলুন, আর আমেরিকার আপেল, আলজীরীয় নাশপাতি বলুন আর সিরিয়ার অরেঞ্জ, লেবানীজ কমলালেবু বলুন আর পাকিস্তানি আম, এমনকি বাংলাদেশি কাঁঠাল পর্যন্ত। যে দেশের যে ফলটি সবচেয়ে সু-স্বাধু বলে পরিচিত তা অপেক্ষাকৃত কম দামেই পাওয়া যায় মক্কা নগরীতে। বরং বর্তমানে দেখা যায় মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে উৎপাদন হচ্ছে নানা জাতের ফলমূল।

কী পরিণতি হয়েছিল শিশু ইসমা'ঈলও বিবি হাজেরার?

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের অন্তরে এ কথা জানার জন্য অদম্য ঔৎসুক্য বিরাজ করছে যে ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক শিশু ইসমা'ঈল এবং তাঁর মা হাজেরাকে মক্কা উপত্যকায় রেখে আসার পর তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? ইহা এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঘটনা (Interesting story) বটে।

ইবরাহীম (আ.) এর রেখে আসা পাথেয় তথা খেজুর ও পানি দু'এক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। ফলে বিবি হাজেরার বুকের দুধও শুকিয়ে গেল। শিশু ইসমা'ঈল কিছু খেতে না পেয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ছটফট করছে। তাঁর মা হাজেরার অবস্থাও তথৈবচ। তিনি কোথাও কোনো আহার্য কিংবা পানীয়ের উৎস খুঁজে না পেয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তদুপরী শিশু ইসমা'ঈলের কাতরানি দৃষ্টে তিনি মানসিকভাবে আরো ভেঙে পড়লেন। তখন বিবি হাজেরা যে মানসিক বিষন্নতায় ভুগছিলেন তার কিছুটা অন্তরে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও লেখনীর ভাষায় তা প্রকাশ করা যে অসম্ভব তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

একদিকে নিঃসঙ্গতা অন্যদিকে মৃত্যুপথ যাত্রী সন্তানের কাতরানি, তদুপরী তৃষ্ণা ও ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে বিবি হাজেরা কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে পড়েছিলেন তখন। তিনি দিশেহারা হয়ে দিক-বিদিক ছোটাছুটি করছিলেন। ডুবন্ত ব্যক্তি যেমন একটি খড় দেখতে পেলেও তাকে অবলম্বন করে বাঁচার প্রয়াস পায়, তিনিও তখন কোনো মানব সন্তানের সন্ধান পাওয়া যাবে কি-না সে আশায় একবার ছাফা পাহাড়ে উঠে চিৎকার দিয়ে বলছিলেন– কোনো আল্লাহর বান্দা আছো কি এখানে? থাকলে এগিয়ে আসা আমার শিশু ও আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। অন্যবার মারওয়া পাহাড়ে উঠে যেন ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছিলেন। পরক্ষণেই আবার ছুটে আসতেন মৃত্যু পথযাত্রী শিশুর পানে, এতক্ষণে তার প্রাণ বায়ু উড়ে গেছে কি-না তা দেখার জন্য। এভাবে বিবি হাজেরা ছাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাত চক্কর দৌড়াদৌড়ি করে পূণরায় ফিরে এলেন শিশু ইসমা'ঈলের দিকে।

তিনি শিশুর কাছে এসে দেখতে পান একজন অপরিচিত পুরুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে বিবি হাজেরা বললেন– তুমি কে আমি তো চিনছি না। তবে তোমার মধ্যে যদি আল্লাহ কোনো কল্যাণ রেখে থাকেন তাহলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। তখন লোকটি শিশু ইসমা'ঈল